KAZI NAZRUL UNIVERSITY

ASANSOL

BIDHAN CHANDRA COLLEGE

BA 6TH SEMESTER PROGRAMME EXAMINATION -2022

NAME :- SUNANDA CHATTERJEE

DISCIPLINE :- BENGALI

COURSE NAME :- PRAKALPA PATRA RACHANA O UPASTHAPANA

COURSE CODE :- BAPBNGSE602

REG NO :- KNU19103001330

ROLL NO :- 10319061111003145

SESSION :- 2019-2020

PHONE NO :- 7029384177

Scanned with OKEN Scanner

যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ ও সাধারণ মানুষ

- বোমার আঘাতে বিধ্বস্ত ইউক্রেন

ইতিহাসের চাকার উপর ভর করে সময় যত এগিয়েছে অন্যান্য পরিবর্তন এর সাথে পৃথিবী বুকে পরিবর্তিত হয়েছে যুদ্ধের রূপ। যদিও যুদ্ধবিশারদরা যুদ্ধকে মানব প্রবৃত্তির সার্বজনীন এবং আদিম দিক হিসাবে দেখেন, কিছু মানুষ একে নির্দিষ্ট সামাজিক-সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক বা পরিবেশগত পরিস্থিতির ফলাফল বলে মনে করেন।
বিশ্ববাসী যুদ্ধের এমন ক্ষতবিক্ষত ছবি আর দেখতে চায় না। তারপরও রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণের এই হৃদয় বিদারক দৃশ্য দেখে বিশ্বের শান্তিপ্রিয় মানুষ হতবাক। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের দাবি ছিল, যুদ্ধ নয়, সামরিক অভিযান। ইউক্রেনের সামরিক ঘাঁটিগুলিই তার সেনাবাহিনীর লক্ষ্য। সে দেশের সাধারণ জনতার কোনো ক্ষয়ক্ষতি হবে না। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। বৃহস্পতিবার থেকে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছেন রাশিয়ার সেনারা।

ইউক্রেনের আকাশ ছেয়ে গিয়েছে রাশিয়ার যুদ্ধবিমানে। সড়কপথে হানা দিয়েছে গোলাবারুদ, রকেট বোঝাই ট্যাঙ্ক। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের দ্বিতীয় দিনেই পুতিন-সেনার হামলায় ঘর-বাড়ি হারিয়েছেন বহু সাধারণ মানুষ। কিয়েভ থেকে চুহুইভ, খারকিভ থেকে মারিইপুল। ইউক্রেনজুড়ে ধ্বংসলীলা হাহাকার। বৃহস্পতিবার চুহুইভের বিস্তীর্ণ এলাকার আকাশ ঢাকা পড়েছিল কালো ধোঁয়ায়। ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই খারকিভের অদূরে চুহুইভের ইউক্রেনের সেনাবাহিনীর বিমানবন্দরে হামলা চালিয়েছে রাশিয়া।

একই সঙ্গে সে দেশের পূর্বাঞ্চলে ডনবাস, দক্ষিণের ক্রাইমিয়া, বন্দর-শহর ওডেসা ছাড়াও বেলারুশ সংলগ্ন উত্তর ইউক্রেন-ত্রিমুখী আক্রমণ চালিয়েছে তারা। বেলা বাড়ার সঙ্গে ইউক্রেনে আক্রমণের তীব্রতা বাড়িয়েছে রাশিয়া। ইউক্রেনের পশ্চিমেও হানা দিয়েছে রাশিয়া। শুক্রবার সকালে ইউক্রেনের
প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির দাবি, হামলায় এখন পর্যন্ত ১৩৭ জন ইউক্রেনীয় নিহত হয়েছেন, আহত অন্তত ৩১৬ জন।

Scanned with OKEN Scanner

কিয়েভ সফরে যান যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন, জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসসহ বিশ্বনেতারা।

ইতিমধ্যে ইউক্রেনে হাজারো মানুষের মৃত্যু হয়েছে। যুদ্ধে বাস্তুচ্যুত হয়েছেন লাখো ইউক্রেনীয়। দেশটির অনেক এলাকা রুশ বাহিনীর দখলে গেছে। তবে তিন মাসের যুদ্ধে রাশিয়া কাঙ্ক্ষিত ফল অর্জন করতে পারেনি বলেও মনে করছেন অনেকে।

প্রশংসা কুড়িয়েছে বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী একটি সশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে ইউক্রেনের প্রতিরোধ লড়াই। তারা সাহায্যও পেয়েছে পশ্চিমা দেশগুলো থেকে। তবে রাশিয়াও দমে যায়নি। এখনো ইউক্রেনের পূর্ব ও দক্ষিণ অংশে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় জোর লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।

তিন মাসের লড়াইয়ে এ পর্যন্ত ইউক্রেনের ৬০ লাখের বেশি মানুষ দেশ ছেড়ে উদ্বাস্তু হয়েছে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘ। তাদের অনেকেই পোল্যান্ডসহ প্রতিবেশী দেশগুলোয় আশ্রয় নিয়েছে। অনেকে ইউরোপের অন্যান্য দেশে গেছে। চলমান যুদ্ধে ইউক্রেনকে অস্ত্র–অর্থসহ সব ধরনের সহায়তা দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা দেশগুলো।

রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মেজর জেনারেল ইগর কোনাশেনকভ আজ রোববার জানান, ইউক্রেনের পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলে হামলা অব্যাহত রয়েছে। দনবাসের ১৩টি জায়গায় ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়ে ইউক্রেনের সেনাবহর ও অস্ত্রের ক্ষতিসাধন করা হয়েছে। দক্ষিণের মাইকোলাইভ অঞ্চলে একটি ভ্রাম্যমাণ অ্যান্টি–ড্রোনব্যবস্থায় রকেট হামলা চালিয়েছে রুশ বাহিনী। এসময় তিনি আরও জানান, এখন পর্যন্ত রুশ বাহিনী ইউক্রেনের ১৭৪টি যুদ্ধবিমান, ১২৫টি হেলিকপ্টার, ৯৭৭টি অন্যান্য আকাশযান, ৩১৭টি বিমানবিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্রব্যবস্থা, ৩ হাজার ১৯৮টি ট্যাংক ও অন্যান্য যুদ্ধযান, ৪০৮টি রকেট লঞ্চার ধ্বংস করেছে।

রুশ বাহিনীর বিরুদ্ধে এখনো সাত লাখ ইউক্রেনীয় সেনা লড়াই করছেন বলে জানিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি।

যুদ্ধ কখনো ব্যবহৃত যুদ্ধাস্ত্রের সংঘর্ষের সঙ্গেই শেষ হয়ে যায় না। যুদ্ধ চলে সংঘর্ষ শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও বহুকাল ধরে। একটি যুদ্ধের ফল যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া দেশকে,

Scanned with OKEN Scanner

আকাশ পথে হামলার সময় ইউক্রেনের সেনাঘাঁটির পাশাপাশি উড়েছে সাধারণ মানুষের ঘরবাড়িও। রাশিয়ার রকেটের হানায় মাথায় হাত পড়েছে চুহুইভের সাধারণ জনতার। যুদ্ধবিমানের আক্রমণে খারকিভের অসংখ্য বাসিন্দার বাড়ি প্রায় ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে। রকেট হামলায় কারো পড়ার ঘরে এসে পড়েছে কংক্রিটের আস্ত চাঁই। কারো বা শোয়ার ঘর ঢেকেছে ধুলোয়।

নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ইউক্রেনের বাসিন্দারা ছুটতে শুরু করেছেন। মেট্রো, ট্রেন বা বাসস্টেশনগুলো মানুষের ভিড়ে একাকার। কিয়েভের মতো ব্যস্ত শহরেও একই ছবি। শহর ছেড়ে অন্যত্র যাওয়ার হিড়িক পড়েছে। যুদ্ধের প্রথম দিনেই মারিইপুলের অনেকেই নিরাপদ আশ্রয় পেয়ে গিয়েছেন। তবে আতংক কাটেনি। শেল্টার হোম থেকে বেঁচে ফেরা যাবে তো?

রাশিয়ান রকেটের হানায় কিয়েভের বহু বাড়ি ভেঙে গুঁড়িয়ে গিয়েছে। রাশিয়ার হামলার মাঝে একফাঁকে ঘরের বাইরে পা রেখেছেন অনেকে। দেখা যাচ্ছে চারপাশে লোহা, কংক্রিট আর কাচের টুকরো ছড়িয়ে রয়েছে। মারিইপুলে ইউক্রেনের সেনাঘাঁটির পাশাপাশি বহু বাসিন্দার ঘরবাড়িসহ অসংখ্য গাড়িও ভেঙেচুরে একাকার হয়ে গিয়েছে। বাড়ির বাইরে পার্ক করা গাড়িতে পড়েছে রকেট। শুক্রবার সকাল থেকেই বিস্ফোরণের শব্দে ঘুম ভেঙেছে কিয়েভের বাসিন্দাদের।

সংবাদ থেকে জানিয়ে দিয়েছেন, শহরে দুটি বিস্ফোরণের জোরালো আওয়াজ শোনা গিয়েছে। এই যুদ্ধের মাঝে পরিজনদের খবরা-খবর নেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন অনেকে। তবে মোবাইল ফোনে যোগাযোগও প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠছে। অনেকেই আবার শিশুসন্তানকে কোলে নিয়ে ছুটেছেন বাস টার্মিনাসে। কিয়েভ ছাড়তে চান বহু মায়েরা। সোয়েটার-মাফলার জড়িয়ে কোলের সন্তানকে জড়িয়ে তারা দাঁড়িয়েছেন বাসের অপেক্ষায়। যুদ্ধ কত দিন চলবে এখনও তা জানা নেই। তবে যুদ্ধের মাঝে অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে অনেকের ভবিষ্যৎ। নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী মজুত করার জন্য তড়িঘড়ি সুপার মার্কেটে জড়ো হয়েছেন অনেকে। ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে বিশুদ্ধ পানির সংকটও দেখা দিয়েছে। অনেকেই প্লাস্টিকের বড় বড় বোতলে পানি কিনতে শুরু করেছেন।

রাশিয়ার এ আক্রমণকে নাৎসি জার্মানির হামলার সঙ্গে তুলনা করেছেন ইউক্রেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী দিমিত্রো কুলেবা। টুইটারে তিনি লিখেছেন, 'কিয়েভে ভয়ংকরভাবে

Scanned with OKEN Scanner

রকেট হামলা চালিয়েছে রাশিয়ানরা। শেষবার আমাদের রাজধানীতে এরকম হামলা হয়েছিল ১৯৪১ সালে, যখন নাৎসি জার্মানি আক্রমণ করেছিল।' তবে তিনি আশাবাদী, 'ইউক্রেন সেই অশুভ শক্তিকে পরাস্ত করেছে। এবারও তা-ই করবে। মারিওপোল আজভস্টলে ছিল ইউক্রেনীয় সেনাদের কাছে শেষের দুর্গ। কিন্তু তা আর করা গেল না। ইউক্রেনের অবস্থা পরের দিন শোচনীয় হয়ে উঠেছে। রুশ বন্ধুদের কাছে আত্মসমর্পণ কর আজভস্টের ইউক্রেনীয় সেনারা। পথের দুর্গে ডর করা গেল না, আরও এখন এলাকাও রুশ রাজনীতিদের কাছে। সম্প্রতি ইউক্রেনীয় সেনাবাহিনীর তরফ থেকে একটি ভিডিও প্রকাশ করা হয়েছে , যেখানে দেখতে পাওয়া যায় একটি বাসের মধ্যে বসে রয়েছেন বহু সৈনিক, যাঁরা আত্মসমর্পণ করেছেন। শুধু তাই নয়, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন বহু আহত সৈনিক। কেউ স্ট্রেচারে শুয়ে রয়েছেন, আবার কেউ বসে রয়েছেন হুইল চেয়ারে। অনেকের শরীরের নানান জায়গায় ব্যান্ডেজ বাঁধা। রীতিমত যুদ্ধ বিধ্বস্ত সৈনিকদের সেই ভিডিও সামনে আসতেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের ২৪ তারিখে রাশিয়া ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যে সামরিক অভিযানের সূচনা করেছিল , প্রায় আড়াই মাস হয়ে গেল এখনও পর্যন্ত তা অব্যাহত রয়েছে । বুচা কিংবা মারিওপোলের বহু এলাকা নরকে পরিণত হয়েছে। বিপর্যস্ত ইউক্রেনের বড় শহরগুলি। রাশিয়ার থেকে ইউক্রেন ছোট্ট একটি রাষ্ট্র হলেও, এতদিন ধরে রুশ সেনাদের ঠেকিয়ে রেখেছে। কিন্তু সম্প্রতি একের পর এক সামনে আসছে আত্মসমর্পনের খবর। বহু পশ্চিমী দেশ পরোক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে ইউক্রেনের পাশে দাঁড়ালেও ইউক্রেনের বহু সাধারণ মানুষের জীবন অত্যন্ত শোচনীয়। লক্ষ্য মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন, বহু জায়গায় রুশ সেনারা চালিয়েছে নরসংহার, সেই তালিকা থেকে বাদ পড়েনি শিশুরাও।

পশ্চিম ইউক্রেনীয় শহর লভিভের রেলওয়ে স্টেশনে থেকে যে ট্রেনগুলি ছাড়ছে, তাতে উপচে পড়ছে পালিয়ে আসা মানুষের ভিড়। সকলেই দেশ ছেড়ে যেতে চান। এমনকী তার জন্য ১০-১৫ ঘন্টা দাঁড়িয়েও যেতে হচ্ছে।

Scanned with OKEN Scanner

গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনে হামলা শুরুর নির্দেশ দেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। দেশটির উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ দিক থেকে একযোগে হামলা চালিয়ে রাজধানী কিয়েভ দখলের কৌশল নিয়েছিল রুশ বাহিনী। বিশ্লেষকদের অনেকেই বলেছিলেন, রুশ হামলার মুখে কয়েক দিনের মধ্য পতন ঘটতে পারে কিয়েভের। বিশাল রুশ সেনাবহর কিয়েভের উপকণ্ঠে পৌঁছেও গিয়েছিল। কিন্তু প্রতিরোধের মুখে পিছু হটে।

ইউক্রেনের দনবাস অঞ্চলে রুশপন্থী বিচ্ছিন্নতাবাদী সেনারাছবি: রয়টার্স

ইউক্রেনে রুশ হামলা শুরুর পর তিন মাস গড়াতে যাচ্ছে। এখনো তুমুল লড়াই চলছে। আজ রোববারও দেশটির বিভিন্ন স্থানে রুশ হামলা হয়েছে। আর রুশ হামলা অব্যাহত থাকায় চলমান মার্শাল ল আরও তিন মাসের জন্য বাড়িয়েছে ইউক্রেন সরকার।

রোববার দেশটির প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি জানান, আগামী ২৩ আগস্ট পর্যন্ত ইউক্রেনে মার্শাল ল বলবৎ থাকবে। এ বিষয়ে পার্লামেন্টের অনুমোদন পাওয়া গেছে। এবার নিয়ে তিনবার মার্শাল লর মেয়াদ বাড়াল ইউক্রেন।

গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনে হামলা শুরুর নির্দেশ দেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। দেশটির উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ দিক থেকে একযোগে হামলা চালিয়ে রাজধানী কিয়েভ দখলের কৌশল নিয়েছিল রুশ বাহিনী। বিশ্লেষকদের অনেকেই বলেছিলেন, রুশ হামলার মুখে কয়েক দিনের মধ্য পতন ঘটতে পারে কিয়েভের। বিশাল রুশ সেনাবহর কিয়েভের উপকণ্ঠে পৌঁছেও গিয়েছিল। কিন্তু প্রতিরোধের মুখে পিছু হটে তারা।

পরে ক্রেমলিন ঘোষণা দেয়, কিয়েভ দখলের ইচ্ছা তাদের নেই। রুশ বাহিনী ইউক্রেনের পূর্ব ও দক্ষিণ অংশে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় পূর্ণ মনোযোগ দেবে। এর পরই

Scanned with OKEN Scanner

ভোগ করতে হয় সুদীর্ঘকাল ব্যাপী। পরাজিত কিংবা বিজিত যে দেশই হোক না কেন যুদ্ধের মূল্য উভয়কেই চুকাতে হয়।

শান্তি হলো বিশ্বের সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত বিষয়। একসময় মনে করা হতো শান্তি স্থাপনের জন্য বোধহয় যুদ্ধ করা হয়। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে সমাজতত্ত্ববিদরা ধারণার অসারতা বিশ্বের কাছে প্রমাণ করেছেন। তারা দেখিয়েছেন পৃথিবীতে এমন কোন সমস্যা নেই যার সমাধান যুদ্ধ ছাড়া সম্ভব নয়।

সৃষ্টিকর্তা মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন বুদ্ধি, মান এবং হুঁশ দিয়ে। সেই মান এবং হুঁশ হারিয়ে ফেলে সংকীর্ণ আবেগের বশবর্তী অবস্থায় হতবুদ্ধি হয়ে মানুষ আত্মধ্বংসের যজ্ঞে লিপ্ত হয়। মানবজীবনের উদ্দেশ্য কখনো ধ্বংস করা হতে পারে না।

সৃষ্টিকর্তার শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি হিসেবে মানব জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত শুধুমাত্র নতুন সৃজনশীল সৃষ্টি যা মানব কল্যাণের কাজে আসবে। বিশ্বব্যাপী সার্বিক উন্নয়নের এমন পরিবেশ কেবলমাত্র রচিত হতে পারে বিশ্ব থেকে যুদ্ধকে সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করে বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার দ্বারা পৃথিবীর সার্বিক উন্নয়নের মধ্যেই মানব জীবনের প্রকৃত সার্থকতা লুকিয়ে আছে।

Scanned with OKEN Scanner

বিভূতিভূষনের প্রকৃতিচেতনা

বিভূতিভূষণ তার উপন্যাসের শরীরের প্রতিটা পশমের গোড়ায় প্রকৃতি নিবিড় ভালোবাসার ছোঁয়া লাগিয়ে, মমতা মাখিয়ে এতোটাই মায়াময়ী রূপ দিয়েছেন যে, প্রকৃতি আর বিভূতিভূষণ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

তার ছোটবেলা দরিদ্রতার মধ্যে কেটেছে। জীবন বাস্তবতার এই ছাপটা ঔপন্যাসিক অপু চরিত্রের মধ্য দিয়ে 'পথের পাঁচালী'তে এঁকেছেন বিভূতিভূষণ পল্লী প্রকৃতির নিসর্গ জীবন তুলে ধরেছেন, ভাষা মাধুর্যের মধ্য দিয়ে মানব জীবনের অন্তর্লীন সত্তার সঙ্গে। তার 'পথের পাঁচালী' যেনো প্রকৃতির সন্তান। প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ গায়ে মেখে বেড়ে ওঠা 'অপু' বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় চরিত্রের একটি।সাধারণ কাহিনীকে অসাধারণ শিল্পকুশলতায় পাঠককে মুগ্ধ করার ক্ষমতা নিয়ে বাংলা সাহিত্যে আগমন ঘটেছিল 'বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের। তিনি পাঠককে কাহিনী বলেননি, কাহিনী দেখিয়েছেন। তার রচনার বর্ণনাভঙ্গি পাঠককে এতো টাই মুগ্ধ করে যে, পাঠক মনের আয়নায় সেই বর্ণনার প্রতিচ্ছবি দেখতে পায়তিনি ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দের ১২ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনার মুরারির গ্রামের মাতুলালয়ে জন্ম নেন। ১৯৫০ সালের ০১ সেপ্টেম্বর ব্যারাকপুরের ঘাটশিলায় অন্যলোকে পাড়ি জমান।ছাপ্পান্ন বছরের জীবনে আঠাশ বছর সাহিত্য রচনা করেন।হাজারও গ্রাম্য কিশোরের প্রতিচ্ছবি এই অপু। অপুর কল্পনাপ্রবণ মানসিকতা যেনো প্রতিটি পল্লী কিশোরের কল্পনা।ট্রেন দেখার জন্য বাবার কাছে অপুর যে আবদার; তেমনি কল্পনা মিশে রয়েছে প্রতিটা পল্লী বালকের মনে। বিভূতিভূষণ এতোটাই গভীর মমতা দিয়ে তার চরিত্রগুলো এঁকেছেন যা সব পাঠককে চুম্বকের মতো টানে এবং মুগ্ধ করে, তৃপ্ত করে।অন্নদাশঙ্কর রায় তাকে 'প্রকৃতি-পাগল সাহিত্যিক' বলে আখ্যায়িত করেছেন। কথাটি যথার্থই বলেছেন তিনি। বিভূতিভূষণ তার উপন্যাসের শরীরের প্রতিটা পশমের গোড়ায় প্রকৃতি নিবিড় ভালোবাসার ছোঁয়া লাগিয়ে, মমতা মাখিয়ে এতোটাই মায়াময়ী রূপ দিয়েছেন যে, প্রকৃতি আর বিভূতিভূষণ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। তার ছোটবেলা দরিদ্রতার মধ্যে কেটেছে। জীবন বাস্তবতার এই ছাপটা ঔপন্যাসিক অপু চরিত্রের মধ্য দিয়ে 'পথের পাঁচালী'তে এঁকেছেন। তাই তো জীবন ঘনিষ্ঠ এই আবেগটুকু পাঠকের মনে সবচেয়ে বেশি নাড়া দেয়। 'পথের পাঁচালী'কে তাই 'একদিকে যেমন জীবনের পাঁচালীও বলা যায়, তেমনি অপুর পাঁচালীও বলা যায়।

Scanned with OKEN Scanner

বিখ্যাত চলচিত্রকার সত্যজিৎ রায় বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালি', 'অপরাজিত' এবং 'অশনি সংকেত' উপন্যাস অবলম্বনে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন এবং বিভিন্ন জায়গায় প্রশংসিত হন। 'পথের পাঁচালি' চলচ্চিত্রের জন্য তিনি আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতি অর্জন করেন। এটিই প্রথম অস্কার পুরস্কারপ্রাপ্ত বাংলা চলচ্চিত্র। এ ছাড়াও 'পথের পাঁচালি' উপন্যাসটি ইংরেজি, ফরাসিসহ বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তিনি রচনা করে গেছেন প্রকৃতির অকৃত্রিম উপাদান 'আরণ্যক' উপন্যাসটি। যেখানে মানুষ খুঁজে পাবে তার আসল গন্তব্য এবং সত্যিকারের আশ্রয়ের ঠিকানা।

কারণ মানুষ প্রকৃতি ছাড়া বেঁচে থাকতে পারে না।প্রকৃতিই তার আসল সঙ্গী। জল যেমন যেতে চায় জলের কাছে তেমনই মানুষও যেতে চায় প্রকৃতির মাঝে। নিজের অস্তিত্ব খুঁজে পায় সে। প্রকৃতি আর মানুষের মধ্যে এভাবেই তো গড়ে উঠেছে আদিম প্রেম এবং যৌথ জীবনের সংসার। 'আরণ্যক' উপন্যাসে মানুষ আর প্রকৃতির নিজস্ব নিঃসঙ্গতাও ফুটে ওঠে ।

মানুষের মতোই প্রকৃতিও রহস্যময় এবং বৈচিত্র্যময়। এই রহস্যময়ী মানুষ ও প্রকৃতিকে পৃথক স্বাধীন মাত্রা দিয়েছেন বিভূতিভূষণ। প্রকৃতির নিগূঢ় সত্তাকে উন্মোচিত করেছেন শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গিতে। তার শিল্পজগৎ প্রকৃতির বিচিত্র রূপ-রস অনুভূতির আনন্দে বিহ্বল। তিনি অধিকাংশ নিসর্গ কবিদের মতো প্রকৃতির জড়-সৌন্দর্য শুধু নয়, জৈবিক মানবজীবনকেও এঁকেছেন একই ক্যানভাসে। প্রকৃতি সম্পর্কে এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি তার একান্ত নিজস্ব মৌলিকতা। বিভূতিভূষণের কাছে কোনো নীতি, তত্ব বা মূল্যবোধের কোনো বিচ্ছিন্ন অর্থ ছিল না, যদি না সেসব নীতি, তত্ব বা মূল্যবোধ মানুষকে আশ্রয় দিতে না পারে।

সুতরাং এ কথা বলা মোটেও অসঙ্গত নয় যে, গ্রামীণ জীবনের নীতিবোধ ও মূল্যবোধের রক্ষণশীলতা বিভূতভূষণ সমর্থন করেননি। তিনি শ্রেণি বিদ্বেষীও নন কিংবা ব্যক্তিগতভাবেও কাউকে ঘৃণার চোখেও দেখেননি। যে কারণে তার অধিকাংশ ছোটগল্পই গ্রামীণ জীবনের শান্তি ও পারস্পরিক নিশ্চিন্ততা নিয়ে বেড়ে ওঠে। তিনি নিজে বলেছেন, 'সাহিত্য আমাদের কল্পনা ও অনুভব-বৃত্তিকে উজ্জীবিত করে।' কলকাতার মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত বিভূতি রচনাবলি দ্বাদশ খন্ডে 'বিভূতিভূষণকে যেমন দেখেছি' শিরোনামের একটি লেখা লিখেছিলেন অন্নদাশঙ্কর রায়। সেখানে তিনি লিখেছিলেন, 'এমন প্রকৃতি-পাগল সাহিত্যিক বাংলাসাহিত্যে বিরল। প্রকৃতিকে চোখে দেখে ভালো লাগে না কার? কিন্' তাকে ভালোবেসে তার গভীরে অবগাহন করা অন্য জিনিস।' বিভূতিভূষণ ছিলেন এমনই প্রকৃতিপ্রেমী সাহিত্যিক।

Scanned with OKEN Scanner

তিনি ছিলেন গ্রামীণ পটভূমির সার্থক শিল্পী। গ্রামের কল্পনাপ্রবণ বালকটি ধীরে ধীরে বড় হয়ে পরিবেশের সঙ্গে যেভাবে খাপ খাওয়াতে সক্ষম হয়, তেমনি করে বাঙালি গ্রাম্য ছেলের জীবনকে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন বিভূতিভূষণ। বাংলা কথাসাহিত্যের সাথে পরিচিতেরা বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়রে নাম শোনেননি ভাবাই যায় না। তার লেখায় ফুটে উঠেছে সবুজ গ্রাম বাংলার চিরায়ত রূপ। গ্রামীণ মানুষের সহজ সরল জীবন নিয়েই তার বেশিভাগ লেখা তার লেখা পড়তে কখনও বা পাঠক হারিয়ে যাবে অপু আর দুর্গার সাথে নিজের ছেলেবেলায়। কখনও সবুজ মাঠে, গ্রামের আমতলায় বা বনবাদাড়ে।

বিভূতিভূষণরে শৈশব ও কৈশোর কাটে দারিদ্র্যের ভেতর। পরে শিক্ষকতা ও লেখালেখি চালিয়ে যান পাশাপাশি।

তিনি মানুষকে দেখেছেন গভীর মমতা ও ভালোবাসা দিয়ে। তার লেখায় আমি নিজেকে খুঁজে পাই তাই তিনি আমার অন্যতম প্রিয় লেখক।
পথের পাঁচালী উপন্যাসের শেষে অপু যখন তার নিজের গ্রামে ফিরে যেতে চায় তখন বিভূতিভূষনের লেখা যেন জীবন্ত হয়ে যায়। মানুষ যে প্রকৃতিরই সন্তান- এই সত্য প্রতিফলিত হয়েছে বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়য়ের বিভিন্ন রচনায়। প্রকৃতির লতাপাতা, ঘাস, পোকামাকড় সবকিছুই গুরুত্বের সঙ্গে স্থান পেয়েছে তাঁর রচনায়। বিভূতিভূষণ প্রকৃতির অনুপুংখ বর্ণনার মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন মানবের গভীর জীবনদৃষ্টিকেও। নিম্ন মধ্যবিত্ত বাঙালির জীবনচিত্র ও সমকালের আর্থ সামাজিক বাস্তবতাও সমানভাবে উঠে এসেছে তাঁর রচনায়। বাংলার পল্লীর অপরূপ সৌন্দর্য বিভূতিভূষণকে শৈশব থেকেই মুগ্ধ করত। পরবর্তীকালে এই প্রকৃতি পাঠের বিস্তৃত অভিজ্ঞতা নানাভাবে তার রচনাকে প্রভাবিত ও সমৃদ্ধ করেছে। কথাশিল্পী বিভূতির জীবনদর্শন এবং শিল্পাদর্শ প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ছড়িয়ে দিতে থাকে জগৎকে- জীবনকে দেখাবার বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি।

Scanned with OKEN Scanner

তিনি তার স্বল্প জীবনে অনেকগুলো গ্রন্' রচনা করেছেন। তার মধ্যে উলেস্নখযোগ্য হচ্ছে, উপন্যাস: 'পথের পাঁচালি', 'অপরাজিত', 'অশনি সংকেত', 'দৃষ্টিপ্রদীপ', 'আরণ্যক', 'আদর্শ হিন্দু হোটেল', 'বিপিনের সংসার', 'দুই বাড়ি', 'অনুবর্তন', 'দেবযান', 'কেদার রাজা', 'অথৈজল', 'ইছামতি', 'দম্পতি' প্রভৃতি। গল্প-সংকলন: 'মেঘমলস্নার', 'মৌরীফুল', 'যাত্রাবাদল', 'জন্ম ও মৃত্যু', 'কিন্নর দল', ' বেণীগিরি ফুলবাড়ি', 'নবাগত', 'তালনবমী উপলখন্ড', 'বিধুমাস্টার', 'মুখোশ ও মুখশ্রী', 'সুলোচনা' প্রভৃতি। কিশোরপাঠ্য: 'চাঁদের পাহাড়', 'মরণের ডঙ্কা বাজে', 'মিসমিদের কবচ', 'হীরা মাণিক জ্বলে', 'সুন্দরবনের সাত বৎসর' প্রভৃতি। ভ্রমণকাহিনী ও দিনলিপি: 'অভিযাত্রিক', 'স্মৃতির রেখা', 'তৃণাঙ্কুর', 'ঊর্মিমুখর', 'বনে পাহাড়ে', 'হে অরণ্য কথা কও' প্রভৃতি। সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি বিভূতিভূষণ সম্পাদনার দায়িত্বও পালন করেন। তিনি 'চিত্রলেখা' নামে একটি সিনেমা পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। তা ছাড়া হেমন্তকুমার গুপ্তের সঙ্গে যৌথভাবে তিনি 'দীপক' পত্রিকা সম্পাদনা করেন।

বিভূতিভূষণের নিজস্ব ধরনের গদ্যে আবৃত ভাষাভঙ্গি ও এর অন্তর্নিহিত কারুকুশলতা গুণে তার কথাসাহিত্য, দিনলিপি, পত্রাদি এবং ভ্রমণকাহিনীগুলো পাঠককে বারবার মোহিত করে। সে কারণেই তার লেখায় বারবার ভেসে ওঠে এমন এক জগতের আহ্বান, যা লুকিয়ে রয়েছে তার মনের গহিনে, কল্পলোকের ভুবন হয়ে। নিত্যদিনের একঘেয়ে বাস্তবতার মাঝেও প্রকৃতি ও মানুষের মেলবন্ধনের সঙ্গে বিগত দিনের স্মৃতিকাতরতার যে অনবদ্য সমাহার, বিভূতিভূষণের লেখনীতে তা বারবার মূর্তময় হয়ে ওঠে। তাই তিনি সমকালে এবং উত্তরকালেও পাঠকনন্দিত, আপন মহিমায় ভাস্বর।

আদি প্রাণের আধুনিক বন্দনাকার বিভূতিভূষণ নিসর্গ চেতনার বাতিঘর। মানব জীবনের রহস্য, জটিলতা, কিছু সুখ, অল্প হাসি-কান্না আর কিছুটা মান-অভিমানকে যিনি স্বার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তার লেখনীর ভেতর দিয়ে। বাংলাসাহিত্যে মৌলিক রচনা হিসেবে বিবেচ্য তার লেখায় ভাষার মার্ধুয, চরিত্রের সাবলীল উপস্'াপন ও ব্যাপকতার ভেতর দিয়ে গ্রামীণ সৌন্দর্য এবং মানুষের জীবন ও সত্তার এক অদ্ভুত বাস্তবতা দেখা যায়। শুধু তাই নয়, বাঙালি নিম্নমধ্যবিত্তের অর্থনৈতিক ও সামজিক জীবনের চিত্রগুলো ফুটিয়ে তুলেছেন এক দক্ষ শিল্পীর মতোই তার সাহিত্যের চির সবুজ পাতাগুলোতে

Scanned with OKEN Scanner

P-..11

বাংলা উপন্যাসে শ্রেষ্ঠত্বের আসন যিনি নিজ গুণে দখল করে নিয়েছেন, তার রচনায় মধুর ও কাব্যধর্মী ভাষাশৈলী প্রয়োগের মাধ্যমে। গ্রামীণ জীবনের অসামান্য রূপকার, নিম্নবর্গের কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। আদি প্রাণের আধুনিক বন্দনাকার বিভূতিভূষণ নিসর্গ চেতনার বাতিঘর। মানব জীবনের রহস্য, জটিলতা, কিছু সুখ, অল্প হাসি-কান্না আর কিছুটা মান-অভিমানকে যিনি স্বার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তার লেখনীর ভেতর দিয়ে। বাংলাসাহিত্যে মৌলিক রচনা হিসেবে বিবেচ্য তার লেখায় ভাষার মাধুর্য, চরিত্রের সাবলীল উপস্'াপন ও ব্যাপকতার ভেতর দিয়ে গ্রামীণ সৌন্দর্য এবং মানুষের জীবন ও সত্তার এক অদ্ভুত বাস্তবতা দেখা যায়। শুধু তাই নয়, বাঙালি

নিম্নমধ্যবিত্তের অর্থনৈতিক ও সামজিক জীবনের চিত্রগুলো ফুটিয়ে তুলেছেন এক দক্ষ শিল্পীর মতোই তার সাহিত্যের চির সবুজ পাতাগুলোতে। সাহিত্য সমালোচকদের মতে, বিভূতিভূষণ যে মানবজগৎ সৃষ্টি করেছিলেন তা সারল্যে অসাধারণ। সনাতন গ্রামবাংলার জনজীবনের চিরায়ত ছবি তিনি এঁকেছেন নিপুণ, দক্ষ শিল্পকুশলতায়। গভীর মমতায়, শ্রমে তিনি এই কীর্তি স্'াপন করে গেছেন। কথাশিল্পী হিসেবে আশ্চর্য রকম সফল তিনি। গ্রামীণ জীবনের শান্ত, সরল, স্নিগ্ধ ও বিশ্বস্ত ছবি ফুটে ওঠে তার নিরাসক্ত কথকতা ও বয়ানে, চুম্বকের মতো টেনে নেয় পাঠককে।

মুগ্ধ করে, বিস্মিত করে। অথচ পথের পাঁচালি, অপরাজিত, আরণ্যক, ইছামতির মতো অসামান্য সব উপন্যাসের রচয়িতা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখালেখির জীবন ছিল স্বল্প। মাত্র আঠাশ বছর। এই লেখকের আয়ু ছিল মাত্র ৫৬ বছর। তার রচনাসম্ভারের মধ্যে রয়েছে ১৫টি উপন্যাস, ২০টি গল্পগ্রন্'', ৭টি কিশোর উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনী এবং দিনলিপি।

Scanned with OKEN Scanner

ব্যক্তি জীবনে তিনি অনেকটাই নিভৃত যাপন করতেন। তাই তাকে অনেকেই নিভৃতচারী কথাশিল্পী হিসেবেও অভিহিত করতেন। বলতে গেলে অনেকটাই নিভৃতে ১৯৫০ সালের ১ নভেম্বর, ঝাড়খন্ডের ঘাটশিলায় তার নিজের বাড়ি 'গৌরীকুঞ্জ'তে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মৃত্যুবরণ করেন। বাংলা গদ্য সাহিত্যে তিনি তার সৃষ্টিকর্মে চিরকাল অমর হয়ে থাকবেন।

-x-

Scanned with OKEN Scanner

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমার বাংলা প্রজেক্ট করতে গিয়ে যার কাছ থেকে উৎসাহ ও অনুপ্রেরনা এবং যিনি প্রতিবেদন প্রস্তুতির ক্ষেত্রেও বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করেছেন তিনি হলেন আমাদের বাংলার অধ্যাপক । তার কাছে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে আমাকে প্রকল্পের কাজে সহায়তা করেছেন।এছাড়াও কলেজের লাইব্রেরী থেকে বই নিয়ে এবং গুগল থেকে কিছু তথ্য সংগ্রহ করে আমরা প্রজেক্টটি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছি ।

বিভিন্ন মূল্যবান তথ্য সহ বিভিন্ন রকম পরামর্শ দিয়ে আমাদের বাংলা অধ্যাপক আমাদের প্রজেক্টটি সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছেন ।এজন্য আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ ।

তারিখ- 6. 6. 2022

সুনন্দা চ্যাটার্জী

Scanned with OKEN Scanner

বিধান চন্দ্র কলেজ

কাজী নজরুল ইউনিভার্সিটি

আসানসোল

বি.এ. ৬ষ্ঠ সেমিস্টার প্রোগ্রাম এস.ই.সি পরীক্ষা, ২০২২

প্রোগ্রাম: বাংলা

প্রকল্পপত্র রচনা:-শরৎচন্দ্রের সমাজচেতনা ও বিভূতিভূষণের প্রকৃত চেতনা

অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা

নাম :- বান্টি রুইদাস

বিভাগ :- বাংলা

কোর্সের নাম :- প্রকল্পপত্র রচনা ও উপস্থাপনা

কোর্স কোড :- BAPBNGSE602

রেজিস্ট্রেশন নম্বর :- KNU1910300 2561

ক্রমিক নাম্বার :- 10319061100 3023

সেশন :- 2019 - 2020

ফোন নম্বর :- 9029286668

শরৎচন্দ্রের সমাজচেতনা :—

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় :— রবি যখন মধ্য গগনে তখন চন্দ্রের উদয় — বলাবাহুল্য সেই চন্দ্র, শরৎচন্দ্র। রবিতাপে ঝলসে গেল না শরৎচন্দ্রের স্বকীয়তা। ১৯০৩-এ 'চোখের বালি' প্রকাশ হয় আর ঐ একই সময়ে শরৎচন্দ্রের 'মন্দির' গল্প 'কুন্তলীন' পুরস্কার পায়। আসলে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের অবলম্বিত পথ থেকে সরে এলেন তিনি, ১৯১০-এ রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' প্রকাশিত হয়ে গেছে, আর শরৎচন্দ্রের প্রথম মুদ্রিত গল্প 'বড়দিদি' প্রকাশিত হয় ১৯১৩-তে। শরৎচন্দ্র তাঁর পূর্বসূরীদের অবলম্বিত অভিজাত সমাজের কাছ থেকে সরে এলেন। তিনি জানালেন — 'সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল, উৎপীড়িত, মানুষ হয়েও মানুষ যাদের চোখের জলের কখনও হিসাব নিলে না, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোনোদিন ভেবেই পেলে না, সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছু অধিকার নাই, এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে, এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে।'

শরৎচন্দ্র তাঁর সমকালে সামাজিক সমস্যাগুলিকে উপলব্ধি করেছিলেন খুব কাছে থেকেই। তাই জীবনের সমস্যাগুলিকে তিনি বেশি করে দেখিয়েছেন, তিনি দেখিয়েছেন, সমাজ ও ব্যক্তির দ্বন্দ্বে দায়ী সমাজ। তবে একথা ঠিকই তিনি সমাজকে দায়ী করলেও, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেও সমাধানের পথ দেখাননি। শরৎচন্দ্র বাংলা কথাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ শিল্পী; এ কারণেই যে, তিনি মানবজীবনের সুখ-দুঃখ ও অশ্রু-বেদনাকে সহানুভূতির রসে ডুবিয়ে এমন স্নিগ্ধমধুর ও বেদনাবিধুর কাহিনী অঙ্কন করেছেন যা, আর কেউ লিখতে

Scanned with OKEN Scanner

পারেন নি। এজন্যই পাঠকের সঙ্গে চরিত্রের একাত্মতা। ঘটনা, চরিত্রকে এর আগে কেউ পাঠকের দরবারে এতটা নিক্তাবেশ আনতে পারেন নি, তাই তাঁর চরিত্রগুলি দুঃখ - লাঞ্ছনা ও রিক্ততার দ্বারাই পাঠকচিত্তে আপনার অধিকার নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়, ১৩৪২ সালের ১১ই মাঘ শ্রীমতী জাহানারা চৌধুরীকে লেখা একখানি চিঠিতে শরৎচন্দ্রের এই অভিমত স্পষ্ট প্রকাশিত হয়েছে। এর ফলে মানুষ বড় হয়; তার দুর্দি উদার হয়। এখানেই শরৎচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথ তাই শরৎচন্দ্র সম্পর্কে বলেছিলেন - 'শরৎচন্দ্র সম্পূর্ণভাবেই ছিলেন নিজের দেশের ও কালের। এটা সহজ কথা নয়'।

রচনাপঞ্জি :- শরৎচন্দ্রের উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি হল - 'বড়দিদি', 'পরিণীতা', 'পন্ডিতমশাই', 'বিরাজ বৌ', 'মেজদিদি', 'চন্দ্রনাথ', 'পল্লীসমাজ', 'অরক্ষণীয়া', 'শ্রীকান্ত', দেবদাস, 'নিষ্কৃতি', চরিত্রহীন', 'দত্তা', 'দ্বিতীয় শ্রীকান্ত', 'বামুনের মেয়ে', 'গৃহদাহ', 'দেনাপাওনা', 'নববিধান', 'পথের দাবী', 'তৃতীয় শ্রীকান্ত', 'শেষ প্রশ্ন', 'চতুর্থ শ্রীকান্ত', 'বিপ্রদাস', 'শুভদা', 'শেষের পরিচয়' ইত্যাদি। শরৎচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'বড়দিদি' (১৯১৩) সালে প্রকাশিত হয় এবং শেষ উপন্যাস 'বিপ্রদাসের' রচনাকাল (১৯৩৫) সাল। তবে মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় 'শুভদা' (১৯৩৮) এবং 'শেষের পরিচয়' (১৯৩৯) সালে। তার প্রথম উপন্যাস 'বড়দিদি' - তে জমিদারের অত্যাচারের কাহিনী বর্ণিত হলেও সমাজনিষিদ্ধ বিধবার প্রেম সমস্যা এবং মাধবীর স্নেহ ভালোবাসাই মুখ্য স্থান গ্রহণ করেছে। সুরেনের বড়দিদির উপর ছেলেমানুষি নির্ভরশীলতা ও মাধবীর স্নেহ - যত্ন কীভাবে ভালোবাসায় রূপান্তরিত হল তারই উপভোগ্য কাহিনী হল 'বড়দিদি'।

• 'বিরাজ বৌ' তে চিরন্তন দাম্পত্য নীতির জয় ঘোষিত হয়েছে। গ্রামীন জীবনে পরিবার জীবনের বাস্তব সমস্যা এখানে রূপায়িত হয়েছে। দাম্পত্য জীবনের করুন মধুর কাহিনী শেষপর্যন্ত ট্র্যাজিক পরিনতিতে সমাপ্ত হয়েছে। শরৎচন্দ্রের কাহিনী বয়ন ও নৈপুন্য ও লোকচরিত্র জ্ঞানের পরিচয় এই উপন্যাসে লক্ষ্য করা যায়।

• 'পন্ডিতমশাই' উপন্যাসে সমাজ সমস্যার শোষনের স্বরূপ চিত্রিত হয়েছে। বৃন্দাবন ও কুসুমের অনিশ্চিত সম্পর্ককে কেন্দ্র করে বিকশিত হয়েছে। এই উপন্যাসে হিন্দু-বিধবাদের সংস্কার আর মানসিকতা, ইংরেজের শোষনে গ্রাম বাংলার দুর্দশা প্রভৃতি নিষ্ঠার সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে। কুসুম চরিত্রটি বেশ জীবন্ত।

• শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসের দুটি দিক- একদিকে সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর সমকালীন পল্লীজীবনের সামাজিক চিত্র ও ভাবী সমাজতান্ত্রিক সমাজের পূর্বাভাসায় এবং অন্যদিকে এই সামাজিক প্রেক্ষাপটে রমা ও রমেশের হৃদয়ের দ্বন্দ্ব নিপুন তুলিতে অঙ্কিত। পল্লীগ্রামের মহাজন ও জমিদারি শোষন, হীন চক্রান্ত, বিদ্বেষ-হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, জাল-জুয়াচুরি, মিথ্যা মামলা প্রভৃতি সমকালীন জীবনের নানান কদর্য রূপ যেমন শরৎচন্দ্র এঁকেছেন, তেমনি শিক্ষা ও চেতনার উন্নয়নের দ্বারা যে এই সমাজের উন্নয়ন সম্ভব তার ইঙ্গিতও দিয়েছেন শরৎচন্দ্র রমেশের মাধ্যমে। বাংলা সমাজের উন্নয়ন ও আদর্শ সমাজ ব্যবস্থার প্রভৃতি তুলে ধরেছেন। এই উপন্যাসে রমা হল ট্র্যাজিক চরিত্র। সে না পেল রমেশকে ও না পেল সমাজের ভালোবাসাকে।

Scanned with OKEN Scanner

• 'চন্দ্রনাথ' উপন্যাসে রয়েছে সনাতন আদর্শের প্রতিফলন। জমিদার পুত্র চন্দ্রনাথের মিলনান্তক প্রেম কাহিনীর পশ্চাতে রয়েছে বিবাহ সমস্যা।

• শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলির 'শ্রীকান্ত' (চার পর্ব) অন্যতম। ঐতিহাসিকদের মধ্যে, এটি উপন্যাস না ভ্রমন কাহিনি — এ নিয়ে বিতর্ক থাকলেও 'শ্রীকান্ত' একটি যথার্থ উপন্যাস। কেউ কেউ আবার একে অভিহিত করেছে আত্মজীবনীমূলক রূপে। 'শ্রীকান্ত' এই উপন্যাসের নায়ক। তার সঙ্গে ইন্দ্রনাথ ও অন্নদাদিদির সম্বন্ধ, রাজলক্ষ্মী - অভয়া- কমল-লতার সম্পর্ক ও প্রেম সম্পর্কের চিত্র। শ্রীকান্ত একটি ভবঘুরে চরিত্র। ইন্দ্রনাথ তার ভবঘুরে চরিত্রের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে ও শ্রীকান্তকে প্রভাবিত করেছে, নারীর প্রতি শ্রীকান্তের একটা সম্মান ও শ্রদ্ধার বোধ গড়ে উঠেছে অন্নদাদিদির প্রভাবে। রাজলক্ষ্মী চরিত্রটি শরৎচন্দ্রের অনবদ্য সৃষ্টি। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, 'বাল্যপ্রনয়ে অভিসম্পাত আছে''।

• শরৎচন্দ্র তাঁর 'দেবদাস' উপন্যাসে বাল্য প্রনয়ের ট্র্যাজেডির দিকটি অঙ্কন করেছেন। দেবদাসের প্রেমের এই হতাশাবোধ 'চন্দ্রমুখী' নামক গনিকার স্নেহ - ভালোবাসায় শান্তি লাভ করেছে।

• 'চরিত্রহীন' বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে এক যুগান্তকারী সৃষ্টি, এই উপন্যাস রচনার পর শরৎচন্দ্রকে অনেক সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়, কারন, লেখক উপন্যাসে নিষিদ্ধ প্রেমের চিত্র আঁকেন। সাবিত্রী কুলত্যাগিনী বিধবা হলেও তার প্রেমের স্বরূপে সতীশ আকৃষ্ট, কিরনময়ী বুদ্ধিমতী রমনী তাই নারী হৃদয়ের অপূর্নতা থেকে উপেন্দ্রের প্রতি তার ভালোবাসার দিকটি তুলে ধরেন। আসলে সতীশ, সাবিত্রী, কিরনময়ী, দিবাকর এরা কেউই চরিত্রহীন নয়, এদের আবেগসত্তাকে তুলে ধরেছে বৈশিষ্ট্যতেই

• 'দত্তা' উপন্যাসে বিশুদ্ধ প্রেমের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। বিজয়ার সঙ্গে নরেনের সম্পর্কের টানাপোড়েন ও মনস্তত্ত্ব নিখুঁতভাবে চিত্রিত। অন্যান্য রয়েছে গ্রামজীবনের সমকালীন চিত্র ও শিক্ষা ভাবনা।

• 'গৃহদাহ' শরৎচন্দ্রের আর এক বিশিষ্ট উপন্যাস। উপন্যাসের মধ্যে লেখক যে সমস্যার অবতারনা করেছেন তা হল নর-নারীর দাম্পত্য জীবনের সমস্যা। এই উপন্যাসটিকে শরৎচন্দ্রের ভাবনা ছিল যে "এটাই তার শ্রেষ্ঠ বই"। ইহাতে নারী হৃদয়ের গভীর রহস্যের কথাসংলগ্ন বিশ্লেষন দেওয়া হইয়াছে।

• 'নববিধান' উপন্যাসে পাশ্চাত্য জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত শৈলেশের সঙ্গে প্রাচীনপন্থী পন্ডিত ব্রাহ্মন উষার দ্বন্দ্ব এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্তঃসারশূন্যতাকে লেখক উপন্যাসে চিত্রিত করেছেন।

• 'আনন্দমঠ'-এর মতো 'পথের দাবী'-তে পরাধীন জাতির সংকট ও বিপ্লববাদের রূপটি চিহ্নিত হয়েছে। এই উপন্যাসে অপূর্ব, ভারতী, সব্যসাচী, সুমিত্রা প্রভৃতি চরিত্রগুলি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের নির্ভিক সৈনিক রূপে চিহ্নিত।

• 'শেষ প্রশ্ন' একটি বিবাদী উপন্যাস। এখানে লেখক এক নতুন জীবনদর্শকে উপস্থাপিত করেছেন।

• 'বিপ্রদাস' উপন্যাসটি পারিবারিক আচারনিষ্ঠার সঙ্গে প্রেমের বিরোধের কাহিনী। বলরামপুরের জমিদার পরিবারের দুই ভাইয়ের ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের তৈরি। দ্বিজদাস এই উপন্যাসের একটি জীবন্ত চরিত্র।

• 'শুভদা' এবং 'শেষের পরিচয়' উপন্যাস দুটি অসম্পূর্ন রচনা। 'শুভদা' উপন্যাসে গ্রামীন সমাজের অবক্ষয়িত রূপ এবং 'শেষের পরিচয়' উপন্যাসে চরিত্রস্খলনের পরও নারীর সহজ সরল রূপের পরিচয় বিধৃত হয়েছে।

Scanned with OKEN Scanner

শরৎচন্দ্রের শিল্পীসত্তার বৈশিষ্ট্য:—

(i) শরৎচন্দ্র কোনো সামাজিক নীতিবোধকে স্বীকৃতি দেননি, বরং এর বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ জানিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে সমাজশক্তি ছিল প্রবল। সেজন্য সে সময়ে সমষ্টি জীবনের দাবি ছিল সবচেয়ে বেশি। কিন্তু শরৎচন্দ্র মনে করতেন, সমাজশক্তি বহিঃশক্তিরূপে ব্যক্তিজীবনের অগ্রগতিকে বাধা দেবে এটা তিনি মেনে নিতে চাননি।

(ii) নারীর সতীত্ব ও নারীত্ব - এ দুটোকে আলাদা করে তিনি দেখতে চেয়েছেন। এমনকি প্রচলিত বিবাহ প্রথাকেও সবক্ষেত্রে সমর্থন জানাননি তিনি। তাই 'শ্রীকান্ত' দ্বিতীয় পর্বের অভয়া এবং 'শেষ প্রশ্ন'- এর কমল দুজনেই বিবাহ না করে ভালোবাসার উপর ঘর বেঁধেছে এবং দুজনেই আশা করেছে, বিবাহিত জীবনের চেয়ে এই ভালোবাসার জীবন সুখের হবে।

(iii) শরৎচন্দ্র বরাবরই ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান বিরোধী। তার অর্থ এই যে নয়, যে তিনি নাস্তিক ছিলেন। তিনি ছিলেন সত্য, শিব ও সুন্দরের উপাসক। সমাজের ধর্মের সঙ্গে সংস্কার-এর সম্পর্ক কত অঙ্গাঙ্গী তা তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই 'গৃহদাহে' রামবাবুর চরিত্র এত নিখুঁত করে এঁকেছিলেন।

(iv) রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের নারী চরিত্রগুলি মূলত সমাজের উচ্চস্তরের। সে তুলনায় শরৎচন্দ্র সমাজের সাধারণ স্তরের ক্ষুদ্র, স্নেহ, প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসায় পরিপূর্ণ নারী চরিত্রগুলি তার উপন্যাসে এঁকেছেন। এখানেই স্পষ্ট হয় ধর্মচেতনা শরৎচন্দ্রের।

(v) শরৎচন্দ্রের রচনারীতির একটি প্রধান গুণ স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা, মনস্তত্ত্বের উদ্ঘাটনে, প্রকৃতির রূপ বর্ণনায়, নারীর স্বরূপ চিত্রণে, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অঙ্কনে রচনারীতি শিল্পসাফল্য লাভ করেছে। কথাসাহিত্য ও জনপ্রিয়তার শীর্ষে তিনি বহুবাহুল্য।

Scanned with OKEN Scanner

ছোটগল্প :— শরৎচন্দ্রের প্রথম গল্প 'মন্দির' 'কুন্তলীন' পুরস্কার পেয়েছিল ১৩০৯ বঙ্গাব্দে, ছদ্মনামে। তারপর ১৯১৩-তে 'বড়দিদি' গল্প প্রকাশের পর বাঙালি পাঠকসমাজ শরৎচন্দ্রের লেখা সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করে। এরপর 'যমুনা' পত্রিকায় 'রামের সুমতি', 'পথ-নির্দেশ', 'বিন্দুর ছেলে' প্রকাশিত হয়। তার উল্লেখযোগ্য গল্পগুলি হল — 'মেজদিদি', 'দর্পচূর্ণ', 'আঁধারে আলো', 'নিষ্কৃতি', 'কাশীনাথ', 'অনুপমার প্রেম', 'বাল্যস্মৃতি', 'একাদশী বৈরাগী', 'বিলাসী', 'মামলার ফল', 'হরিলক্ষ্মী', 'মহেশ', 'অভাগীর স্বর্গ', ইত্যাদি গল্পগুলি বর্মায়, ভাগলপুরে, হাওড়ায় থাকাকালীন সময়ে রচনা করেন। তার বিখ্যাত 'অভাগীর স্বর্গ', 'একাদশী বৈরাগী' ও 'মহেশ' গল্পগুলিতে গ্রামীণ জীবনের সমাজ সমস্যার দিকটি চিত্রিত হয়েছে। 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে এক বাগ্দী বিধবার মনে ধনী গৃহিনীর দৃষ্টান্তে শাস্ত্রসম্মত সংস্কারের ইচ্ছা কিরে সামাজিক চাপে অপূর্ণ থেকে গেল তার করুণ কাহিনী। 'একাদশী বৈরাগী' গল্পে কৃপণের মনস্তত্ত্বঘটিত অসঙ্গতি চিত্রিত হয়েছে। অন্যদিকে 'মহেশ' গল্পে গরুর প্রতি আচরণে ব্রাহ্মণ ও মুসলমানের মধ্যে কল্পিত পার্থক্যের অসারতা অপূর্ব করুণ রসস্ফুরণের সাহায্যে চিত্রিত হয়েছে। 'মহেশ' নামক গরুটির মধ্যে মানব ধর্মের আরোপ করেছেন লেখক। শরৎচন্দ্র প্রায় ২৫ টি গল্প রচনা করেছেন। যা একালের পাঠকমনে আকর্ষণীয়। ১৯৩৮ সালে শরৎচন্দ্রের মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেন, "যিনি বাঙালীর জীবনের আনন্দ ও বেদনাকে একান্ত সহানুভূতির চিত্রিত, তার অকাল প্রয়াণে দেশবাসীর সঙ্গে আমিও গভীর মর্মবেদনা অনুভব করছি।"

বিভূতিভূষনের প্রকৃতিচেতনা :—

বিভূতিভূষন বন্দ্যোপাধ্যায়:— কথাসাহিত্যিক উপন্যাসিক ও ছোটোগল্পকার বিভূতিভূষন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৯৪ সালে জন্মগ্রহন করেন এবং তিনি ১৯৫০ সালে প্রয়াত হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখনও শুরু হয়নি। কিন্তু তার আসন্ন প্রভাবে অনুমান করে ভারত তথা বাংলাদেশের সমাজ ও সাহিত্যের পরিবেশ ও পরিস্থিতির মধ্যে দেখা গেছে একটা অস্থির অবস্থা। রবীন্দ্রনাথ- শরৎচন্দ্র কল্লোল গোষ্ঠী, মানিক-তারাশঙ্করের দহনদীপ্তিতে বাংলা কথাসাহিত্যের জগৎ তখন সারস্বত ভূমি বিপন্ন, কোলাহল মুখর। ধরে নেওয়া হয়েছে পল্লীবাংলার বিস্ময়ের বিষয় নিঃশেষিত। নগরজীবন আর সুতীক্ষ্ণ সমাজ- সমস্যায় জর্জর প্রশ্ন- শরগুলির একের পর এক নিক্ষেপে লেখকেরা ক্লান্ত, আশাহত। আর ঠিক সেইসময় প্রায় রূপকথাসুলভ 'পথের পাঁচালী'র খবর নিয়ে দেখা দিলেন বিভূতিভূষন বন্দ্যোপাধ্যায়, যা পড়ে "আমরা জ্বালা ভুলে গেলাম, অভিযোগ ভুলে গেলাম, তিক্ততা ভুলে গেলাম। মনে হল, 'এখনো অনেক রয়েছে বাকী'। শহরের জীবনে যখন নিরবচ্ছিন্ন ক্ষতির খতিয়ান - তখন এই বাংলাদেশেরই গ্রামপ্রান্তে একটা 'সব পেয়েছি-র জগৎ' আছে। সেখানে দারিদ্র্য, দুঃখ, বেদনা, শোক সবই আছে, কিন্তু তাদের সমস্ত কিছুতে এমন একটি মধুমান প্রশান্তি বিকীর্ন হয়ে রয়েছে যে তার আশ্রয়ে এখনো নিশ্চিন্তে নিমগ্ন হয়ে থাকা যেতে পারে"।

জন্ম ও কর্মজীবন :— বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৯৪ খ্রি: ১২ ই সেপ্টেম্বর। বাবা মহানন্দ, মা মৃনালিনী দেবী। লেখকের জন্ম মাতুলালয়ে, নদীয়া জেলার কাঁচড়াপাড়ার কাছে ঘোষপাড়া মুরাতিপুর গ্রামে। পৈত্রিক বাসস্থান ছিল ২৪ পরগনা জেলার বনগাঁ মহকুমার অন্তর্গত ব্যারাকপুর গ্রামে। এই ব্যারাকপুর ছিল 'চালকি ব্যারাকপুর' নামে পরিচিত। বনগাঁ থেকে এর দূরত্ব ছিল প্রায় ৫-৬ কিলোমিটার। চব্বিশ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার পানিতর গ্রামে ছিল তার আদিপুরুষের অঞ্চলগুলির মধ্যে ছিলেন একজন খ্যাতনামা শাস্ত্রজ্ঞ পন্ডিত, কথক এবং কবিতা ও নাটকে রচয়িতা রূপে সুপরিচিত। লেখক এই পৈত্রিক-সূত্রেই কথকতা, সাহিত্যরচনা এবং দেশভ্রমনের নেশা অর্জন করেছিলেন। বিভূতিভূষন ছিলেন মহানন্দের দ্বিতীয় স্ত্রী মৃনালিনীর পাঁচ সন্তানের মধ্যে জ্যেষ্ঠ। তাঁর অপর ভাই-বোনেরা হলেন - ইন্দুভূষন, জাহ্নবী, সরস্বতী ও নটুবিহারী।

বিভূতিভূষনের শিক্ষার সূচনা প্রথমে বাবার কাছে, তারপর বিভিন্ন পাঠশালায়, শেষে কোলকাতায় আপার প্রাইমারী পাঠশালায়। তারপর বনগ্রাম হাইস্কুলে পঞ্চম শ্রেনীতে তিনি ১৯০৮ খ্রি: ভর্তি হন। ১৯১৪ খ্রি: প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ন হয়ে রিপন কলেজে ভর্তি হন। সেখান থেকে ১৯১৬ খ্রি: প্রথম বিভাগে আই.এ. এবং ১৯১৮ খ্রি: ডিস্টিংশন নিয়ে বি.এ. পাশ করেন। পরে দর্শনশাস্ত্রে এম.এ ও ল ক্লাসে ভর্তি হন। তবে প্রথমা স্ত্রী গৌরীদেবীর মৃত্যুতে এবং শেষপর্যন্ত কর্মসূত্রে জড়িয়ে পড়ায় তা সমাপ্ত হয়নি। স্কুল শিক্ষকতা দিয়ে কর্মজীবন শুরু করে, পরে সহকারী ম্যানেজার পদে থাকাকালীন বাংলাদেশ, ভাগলপুর প্রভৃতি স্থানে ভ্রমন করেন।

সাহিত্যজীবন :— হরিনাভি স্কুলে শিক্ষকতা করার সময়ে পাঁচু-গোপাল বা যতীন্দ্রমোহন রায় নামে এক শিশুকবির জন্য বাধ্য হয়ে বিভূতিভূষণ প্রথমে একটি ছোটগল্প লেখেন — 'উপেক্ষিতা', ১৩২৮ সনের মাঘ মাসের 'প্রবাসী'তে এটি ছাপা হয়। গল্পটি পড়ে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় লেখককে একটি চিঠিতে (২৫.১.১৯২২) অভিনন্দন জানান। তিনি আরও একটি গল্প লেখেন 'উমারানী'। কারও কারও মতে এই গল্প লেখার জন্যই বিভূতিভূষনকে হরিনাভি স্কুল ছাড়তে হয়, তারপরে 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয় তাঁর 'নাস্তিক', 'পুঁইমাচা' প্রভৃতি গল্প, তিনি 'পথের পাঁচালি' লিখতে শুরু করেন ১৯২৫ খ্রি:। 'বিচিত্রা' সম্পাদক বন্ধু উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে তিনি এটি পড়ে শোনান। 'বিচিত্রা'য় ১৩২৫ বঙ্গাব্দের আষাঢ় থেকে ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যা পর্যন্ত এটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশের উদ্যোগ নেন লেখকের বন্ধু নীরদ সি চৌধুরী এবং সজনীকান্ত দাস। বিভূতিভূষনের পরবর্তী উপন্যাস 'অপরাজিত' ১৩৩৬ থেকে ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের মধ্যে মাসিক 'প্রবাসী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়, অন্যদিকে ১৯৩৩ খ্রি: ৫ই এপ্রিল প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের বরানগরের বাড়িতে তাঁর 'কল্পলোকের দেবতা' রবীন্দ্রনাথের সাথে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তারপর অধ্যাপক হিসেবে ধর্মতলা কলেজে বাংলা সাহিত্য পড়ানোর সময় শেষপর্বে 'কাজল' লেখেন, কিন্তু তার ইচ্ছা অসম্পূর্ন থেকে যায়। ১৯৫০ খ্রি: ১লা নভেম্বর তার জীবনাবসান ঘটে। পরবর্তীকালে তার সুযোগ্য পুত্র তারাদাস তা সম্পন্ন করেন।

বিভূতিভূষণের রচনাসমূহ :-

(i) উপন্যাস :- 'পথের পাঁচালী' (১৯২৯) 'অপরাজিত' (১৯৩২), 'দৃষ্টিপ্রদীপ' (১৯৩৫), 'আরণ্যক' (১৯৩৯), 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' (১৯৪০), 'বিপিনের সংসার' (১৯৪১), 'দুই বাড়ী' (১৯৪১), 'অনুবর্তন' (১৯৪২), 'দেবযান' (১৯৪৪), 'কেদাররাজা' (১৯৪৫) 'অথৈ জল' (১৯৪৭), 'ইছামতী' (১৯৫০) 'দম্পতি' (১৯৫২) 'অশনি সংকেত' (১৯৫৯)।

(ii) গল্পগ্রন্থ :- 'মেঘমল্লার', 'মৌরীফুল', 'যাত্রাবদল', 'জন্ম ও মৃত্যু', 'কিন্নরদল', 'বেনীগীর ফুলবাড়ি', 'নবাগত', 'উপলখণ্ড', 'বিধু-মাস্টার', 'ক্ষণভঙ্গুর', 'অসাধারণ', 'মুখোশ ও মুখশ্রী', 'নীলগঞ্জের ফালমন সাহেব', 'জ্যোতিরিঙ্গণ', 'কুশল পাহাড়ী', 'রূপ হলুদ', 'ছায়াছবি', 'অনুসন্ধান', ইত্যাদি।

(iii) শিশুসাহিত্য :- 'চাঁদের পাহাড়' (১৯৩৭), 'মরণের ডঙ্কা-বাজে' (১৯৪০), 'মিসমিদের কবচ' (১৯৪২), 'তালনবমী' (১৯৪৪), 'হীরামানিক জ্বলে' (১৯৪৬), ইত্যাদি।

(iv) ডায়েরি/দিনলিপি :- 'স্মৃতির রেখা' (১৯৪১), 'তৃণাঙ্কুর' (১৯৪৩), 'ঊর্মিমুখর' (১৯৪৪), 'উৎকর্ণ' (১৯৪৬), 'হে অরণ্য কথা কও' (১৯৪৮), 'বিভূতিভূষণের অপ্রকাশিত দিনলিপি' (১৯৮৩), ইত্যাদি।

(v) ভ্রমণ কাহিনী :- 'অভিযাত্রিক' (১৯৪১), 'বনে পাহাড়ে' (১৯৪৫)।

(vi) বিবিধ গ্রন্থ :- 'বিচিত্র জগৎ', 'সচিত্র সন্দর্ভ', 'আইভ্যানহো', 'অনুবাদ রচনা', 'অভিনব বাংলা ব্যাকরণ', 'টমাস বাটার-আত্মজীবনী', 'আমার লেখা', প্রভৃতি প্রবন্ধ সংকলন রচনা করেন। ১৯৫০ খ্রি: 'ইছামতী' উপন্যাসের জন্য তাঁকে মরণোত্তর 'রবীন্দ্র' পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়।

বিভূতিভূষণ একাধিক ছোটোগল্পের রচয়িতা। তার রচিত গল্পগুলির মধ্যে আছে মানবজীবনের "ছোট দুঃখ ছোট ব্যথা" -র কথা। সেখানে প্রকৃতির মধ্যে বিচরণশীল মানুষের পরিচয় যেমন আছে, তেমনি রোমান্টিক তথা কল্পনা ও সৌন্দর্যের অনুভূতিতে রহস্যময় জগতের সংবাদও আছে, যেমন 'মেঘমল্লার' গল্পে দেখা যায় শাপভ্রষ্টা সরস্বতীকে উদ্ধারের জন্য তরুন এক সঙ্গীত সাধকের আত্মবিসর্জনের কাহিনী। বিপরীতভাবে সাধারনভাবে জীবনের নিত্য পরিচিত আশা-আকাঙ্খা ও বেদনার সামান্য উপকরনেও তাঁর বেশ কিছু গল্প রচিত হয়; যেমন 'মৌরীফুল' গল্পে এক কলহনিপুনা গ্রাম্যবধূ সুশীলার করুন কাহিনী মূর্ত হয়। 'পুঁইমাচা' গল্পে সরল, স্বল্পবুদ্ধি, ভোজনলুব্ধা একটি মেয়ে ক্ষেন্তির পুঁইশাক খাওয়ার সামান্য বাসনার স্মৃতি বেদনার কান্নার কালিতে লেখা হয়; "সেই লোভী মেয়েটির লোভের স্মৃতি পাতায় পাতায় শিরায়-শিরায় জড়াইয়া তাহার কত সাধের নিজের হাতে পোঁতা পুঁইগাছটি মাচা জুড়িয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে বর্ষার জল ও কার্তিক মাসের শিশির লইয়া কচি কচি সবুজ ডালগুলি সুপুষ্ট, নধর, প্রবর্ধমান জীবনের লাবন্যে ভরপুর।" তার (চলচ্চিত্রায়িত) 'আহ্বান' গল্পে বুড়ির "অ মোর গোপাল" ডাক লেখক-পাঠক নির্বিশেষে সর্বশ্রেনীর মানুষকে অসাম্প্রদায়িক স্নেহে সিক্ত করে। 'তুচ্ছ' গল্পে কামারদের ছোট মেয়েটির মাথায় কয়েক ফোঁটা গন্ধ- তেল ঢেলে দেওয়ার আনন্দ ও চরিতার্থতা লেখক-নায়ক অনুভব করেন এইভাবে "কিন্তু

কি আনন্দ আমার স্নান করতে নেমে নদীজলে। তাঁর নীল আকাশে কিসের যেন সুস্পষ্ট সৌন্দর্যময় বাণী। অন্তরে ও বাইরের রেখায় রেখায় মিল। চমৎকার দিনটা; সুন্দর দিনটা।" এই আনন্দানুভূতিতেই বিভূতিভূষনের ছোটোগল্প পাঠককে আবিষ্ট করে। আর এই কারনেই প্রকৃতিতাপস বিভূতিভূষন বাংলা কথাসাহিত্যে চিরস্মরনীয় হয়ে আছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে গ্রাস বাংলায় ১৩৫০ বঙ্গাব্দে যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, তার যথাযথ বিশ্বাদাত ঐতিহাসিক চিত্র 'অশনি সংকেত' উপন্যাস। পঞ্চাশের মন্বন্তরের সূচনা এবং বিস্তারের রূপটি এই উপন্যাসে বিশ্বস্তভাবে প্রতিফলিত হয়। দুর্ভিক্ষের কালো ছায়া কীভাবে ভদ্র-মর্যাদিত থেকে শুরু করে অপজাত মানুষজনের জীবনে পর্যন্ত বিস্তারিত হয় এই উপন্যাসে তা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় বর্নিত হয়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :—

আমি সর্ব প্রথম কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমাদের বিপিন চন্দ্র কলেজের বাংলা বিভাগের সব শিক্ষক মাননীয় শ্রী- জয়ন্ত নারায়ন ভট্টাচার্য- স্যারকে। কারন ওনার সহযোগিতায় এই ব্যবহারিক প্রকল্পটি সম্পন্ন করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। তাছাড়া আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার পার্শ্ববর্তী শিক্ষক মহাশয় কেও, যিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন।

সেই সঙ্গে ধন্যবাদ জানাই আমার সহপাঠিকে, যার দ্বারা প্রকল্পটি রূপায়নের ক্ষেত্রে কোনো না কোনোভাবে সহযোগিতা পেয়েছি।

ধন্যবাদান্তে

শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর :— Banti Ruidas
রোল নং :— 1031906111003023
শিক্ষাবর্ষ :— 2022
সেশন :— 2019 - 2020
সেমিস্টার :— ষষ্ঠ

* বিপিন চন্দ্র কলেজ

!!